অপরাধ ॥ ছাত্ররাজনীতি নয় রাজনীতিতে ছাত্রদের ব্যবহার

প্রসঙ্গ শিক্ষা

ড. মনজুর আহমদ

প্রধানমন্ত্রী ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করার কথা বলেছেন। সরকার জাতীয় সংসদের আগামী অধিবেশনে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করে একটা আইনের প্রস্তাব আনার কথা ভাবছে।

সরকার বিব্রত। শিক্ষাঙ্গনে সশস্ত্র ক্যাডার আর লুটেরাদের নর্তন-কুর্দন। হল দখল ও নিয়ন্ত্রণের জন্য আক্ষরিক অর্থে যুদ্ধ। মাফিয়া কায়দায় চাঁদা আদায়। ভাইস চ্যান্সেলরদের বরখাস্ত বা পছন্দমতো নিয়োগের উচ্ছৃঙ্খল দাবি। এ সবই ক্ষমতাসীন জোটভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আনুগত্যের দাবিদার ছাত্র নামধারী লোকদের কীর্তি। গত সরকারের আমলে এমন ব্যাপার কখনও ঘটেনি তা নয়। তবে এবারের নির্বাচনে ভূমিধস বিজয়ের পর প্রধানমন্ত্রী বিপর্যস্ত আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পালটে দেয়ার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে তাঁর দলের ছাত্র শাখার নির্বাহীদের কার্যকলাপ স্থগিত হওয়ার কথা। এর পরও শিক্ষাঙ্গনের পরিস্থিতিতে উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এ ব্যাপারটা সরকারকে বিড়ম্বনায় ফেলেছে। দীর্ঘকালের লালিত ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন আজ আর আয়ত্তে নেই বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। শিক্ষাঙ্গনের উৎকট ঘটনাবলী কার্যত রাজনৈতিক আচারের গভীরে নিহিত ব্যাধিরই প্রকাশমাত্র। এটাই দুর্ভাগ্যজনক সত্য। ছাত্ররাজনীতি বলতে জাতীয় অথবা শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা ও বিতর্কে ছাত্রদের সংশ্লিষ্টতাই বোঝায়। সময় সময় তা প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশে রূপ নিতে পারে। গণতন্ত্রমনা নাগরিকরা এ সবকে সমস্যা মনে করবেন না। বরং এটাই স্বাভাবিক বলে মেনে নেবেন তাঁরা। সমস্যা হয় তখনই যখন দলীয় এমনকি ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দল ছাত্রদের যথেচ্ছ ব্যবহারের হাতিয়ার হিসাবে দেখতে শুরু করে। আসলে আন্তর্জাতিক আর জাতীয় রাজনীতির বিভিন্ন প্রশ্নে শিক্ষার্থীদের মতামতের স্বাধীন ও মুক্ত প্রকাশে প্রাণস্পন্দনময় ছাত্ররাজনীতি শিক্ষাঙ্গন থেকে অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ নিয়ে বেরিয়ে আসা তরুণরা এখন শিক্ষাজীবনে ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনের অনন্দ-উত্তেজনার অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত। নির্বাচিত ছাত্র ইউনিয়ন আয়োজিত সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়ার সুযোগ তাদের হয় না। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো শিক্ষাঙ্গনে যে সব ক্যাডার ও পেশীধরকে নিয়োগ করেছে তারা দেশের শিক্ষাঙ্গন থেকে শিক্ষার্থীদের এই গণতান্ত্রিক স্ব-ব্যবস্থাপনাকে তিরোহিত করেছে।

ছাত্ররাজনীতিকে কলুষিত করার ও শিক্ষাঙ্গনকে বিষাক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ষাটের দশকে পাকিস্তানী সামরিক শাসনের যুগে। সামরিক স্বৈরাচারীদের তল্পীবাহকরা তখন গঠন করে জাতীয় ছাত্রফেডারেশন বা এনএসএফ নামের একটি প্রতিষ্ঠান। তখনকার সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ ছিল এই এনএসএফের পরিকল্পনাকারী ও তহবিলের যোগানদার। ছাত্র সংগঠনকে রাজনৈতিক দলের লেজুড় করে রাখার ধারা স্বাধীনতাপরবর্তী বাংলাদেশেও অব্যাহত থাকে। পরে যে সব সামরিক শাসকের আবির্ভাব ঘটে তারাও প্রেরণা ও শিক্ষার জন্য পাকিস্তানী আমলের জঙ্গী পূর্বসূরিদের প্রতি নজর ফেরায়। নেহাৎই রাজনৈতিক প্রভুদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য নতুন নতুন ছাত্র সংগঠনের জন্ম দেয়া হয়।

পরিতাপের বিষয়, ১৯৯০ সালে গণতন্ত্র পুনর্প্রতিষ্ঠার পরও রাজনৈতিক দলগুলো জঙ্গী শাসকদের রেখে যাওয়া ব্যবস্থাকেই সুবিধাজনক মনে করে। প্রধান দলগুলো ছাত্র সংগঠন কব্জা করে নিজেদের রাজনৈতিক লক্ষ্য হাসিলের হাতিয়ারে পরিণত করে নেয়। এসব ছাত্র সংগঠন যথার্থ এবং স্বাধীন ছাত্র সংগঠন হিসাবে কাজ করার ক্ষমতা হারায়। ছাত্র সংগঠনগুলোকে দলীয় রাজনীতির আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত করার ব্যাপারটি গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে দলীয়করণের ধারারই একটি নমুনা। ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে তাঁবেদারদের বহাল করার এবং রাখার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দলগুলো এই আইনের নির্লজ্জ অপব্যবহার করে আসছে। বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যদের সাম্প্রতিক চাকরিচ্যুতি এবং এসব পদে দলীয় তাঁবেদারদের নিয়োগ শিক্ষা প্রশাসনে আস্থা ফিরিয়ে আনায় আদৌ সহায়ক হয়নি। আনুগত্য নিয়ে চরম উৎকণ্ঠা এবং দলের সমর্থকদের দাবি ও লোভ মেটানোর চেষ্টা প্রাইমারী স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য ও কর্মধারাকে বিকৃত করে তুলেছে।

ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করার একটি আইন কিভাবে সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়া ক্ষত নিরাময়ে সহায়ক হতে পারে? সমস্যা যেখানে রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিকদের আচরণ ও মূল্যবোধকে নিয়ে, সেখানে শিক্ষার্থীদের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে আইন প্রণয়নের যৌক্তিকতা কতটুকু? এই আইনের সফল প্রয়োগ কিভাবে হবে? এমন একটি আইন সাংবিধানিক নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে আইনী চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ার সম্ভাবনাই সমধিক।

বিরাজমান অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বিশেষ পদক্ষেপ দাবি করে। শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক তৎপরতায় একটা সাময়িক বিরতির পক্ষে সবল যুক্তি দেয়া যেতে পারে। তবে সরকার এবং ক্ষমতাসীন জোটভুক্ত দলগুলোর নিজেদের আচরণে পরিবর্তনের মাধ্যমেই এই বিরতি কার্যকর হতে পারে। সমস্যার যারা শিকার সেই ছাত্রদের দায়ী করে প্রণীত আইন দিয়ে এর সুরাহা হতে পারে না। এতে বরং নতুনভাবে ছাত্র বিক্ষোভ সৃষ্টির আশঙ্কাই বেশি।

প্রশাসক ও শিক্ষকদের নিয়োগ ও পদোন্নতিতে এবং অন্যান্য শিক্ষাসংক্রান্ত সিদ্ধান্তে দলীয় আনুগত্যই যদি মূল বিবেচ্য থাকে, তবে সমস্যা সমাধানের পথে এগুনোর আশা খুবই কম। ক্ষমতাসীন জোটের অন্তর্ভুক্ত দলগুলো রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে একতরফাভাবে নিজেদের দলের সঙ্গে যুক্ত ছাত্র সংগঠনগুলোকে ভেঙ্গে দিয়ে। প্রচ্ছন্নভাবে অনুগত শিক্ষক শাখাগুলোর প্রশ্নেও একই ব্যবস্থা নিতে হবে। তখনই কেবল সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসকদের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারবে। পারবে তাঁদের কাছে দাবি করতে যেন তাঁরা প্রচলিত আইন ও নিয়মের মাধ্যমে প্রশাসন চালান, নির্ভয়ে ও পক্ষপাতহীনভাবে। সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে পারবে শিক্ষাঙ্গনে আইন ও নিয়মের নিরপেক্ষ প্রয়োগে সার্বিক সমর্থন ও সহায়তা প্রদানে। এ জন্য নতুন আইন নিষ্প্রয়োজন।

[লেখক ইউনিসেফ সদর দফতরের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষা উপদেষ্টা]

DEC 13 2001